দুঃস্বপ্নের দেবতামুড়া

বিজন দেব

॥ ১ ॥

অমরপুরে দেবতামুড়া, ত্রিপুরার আরেকটি দর্শনীয় স্থান। উনকোটির মত শক্ত পাথরের শরীরে খোদাই করা দেবদেবীর বিগ্রহ। গোমতীর ঢাল বেয়ে প্রায় ৩ কিমি. খাড়া পাথরের ঢালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মূর্ত্তিগুলি। স্রোতের অনুকূলে রোমাঞ্চকর নৌকা বিহারে বিগ্রহ দর্শন। একদিনের জমজমাট ট্রিপ।

মনস্থির করে ফেললাম। আমার ঘরের কাছে আর্শীনগরের দর্শন অনিবার্য। ত্রিপুরা ট্যুরিজমের সাইট খুঁজে ফোন ধরলাম আগরতলা ট্যুরিজম বিভাগের সহায়তা কেন্দ্র।

মিষ্টি গলায় নমস্কার জানিয়ে একজন মহিলা কর্মী ফোন ধরলেন। প্রশ্ন করতেই গড়গড় করে জানিয়ে গেলেন দেবতামুড়া নিয়ে যাবতীয় তথ্য। দেবতামুড়া আমার জন্য তৈরী হয়ে আছে। রাত্রিবাসের জন্য 'সাগরিকা গেষ্টহাউস' আর একবার অমরপুর পৌঁছে সাগরিকায় চেকইন্ করলেই দেবতামুড়া দর্শনের সব দায়িত্ব দীপকবাবুর, সাগরিকা পর্যটন নিবাসের ম্যানেজার। মহিলা আমাকে দীপকবাবুর মোবাইল নম্বরটাও দিয়ে দিলেন।

ত্রিপুরা পর্যটন বিভাগ আর সহায়তা কেন্দ্রের মহিলাটিকে বারবার সেলাম ঠুকে আহ্লাদে আটখানা হলাম। আমাদের স্বপ্নের ত্রিপুরা। পর্যটন বিভাগ থেকে রাঁস্তর মোড়ে মোড়ে টাঙানো বিশাল হোর্ডিংগুলো যেন আমার চোখের সামনে হঠাৎ সত্যি হয়ে উঠল। এ যেন বিজ্ঞাপন আর রাঁস্তর মিলেমিশে একাকার। পর্যটকদের প্রতি এত দরদ ! গর্বে মজে রইলাম সারাদিন।

॥ ২ ॥

আগরতলা থেকে অমরপুরের দূরত্ব ৭৫ কিমি। নাগেরজলা স্ট্যান্ড থেকে বাসে চাপলে প্রায় ২ ঘন্টা গন্তব্য। অমরপুরে এসে পৌঁছলাম একটু সকাল সকাল। দীপকবাবুকে ফোন করে পর্যটন নিবাসের রুম আগে থেকেই বুক করা ছিল। একটু ফ্রেস হয়ে হালকা কিছু খেয়েই বেরিয়ে পড়ব দেবতামুড়া অভিযানে।

সেদিন অমরপুরে সাগরিকার আশ্রয়ে রাত্রিযাপন, পরদিন প্রথমবেলা ডম্বুর ঘুরে আগরতলা হয়ে শেষ ট্রেনে আবার ধর্মনগর, মোটামুটি এই হল ভ্রমণসূচী।

কিন্তু হায় ত্রিপুরেশ্বরী ! সাগরিকা পর্যটন নিবাসে পা দেবার সাথে সাথে কিভাবে একের পর এক বিভ্রান্তি আর দুর্ভোগ আমার সমস্ত ভ্রমণসূচী আর আশার উপর জল ঢেলে প্রায় ৩ ঘন্টার মধ্যেই আমাকে অমরপুর থেকে বিদায় করেছিল, সেই গল্পটাই আজ করা যাক।

॥ ৩ ॥

সকাল ৮টায় নয়নাভিরাম ফটিক সাগরের পাড়ে সাগরিকার কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলেন দীপকবাবু। ঘুমজড়ানো চোখে একটু সলজ্জ হেসে বললেন আমার জন্য বরাদ্দ ১০৫ নং রুম এক নবদম্পতির দখলে। সকাল ৮টার মধ্যে রুম ছাড়ার কথা থাকলেও সেই প্রস্তাবে আপাতত মুলতুবী। কয়েকবার অনুরোধ ও মৃদু শাসানি দিলেও কোন কাজ হয়নি। চেক আউট টাইম দুপুর ১১ টায়। উনারা ঘর ছাড়বেন ঐ সময়েই। দীপকবাবু খুব লজ্জিত। আমাকে নিয়ে বসালেন উনার ঘরে। পর্যটন নিবাসের অন্য কর্মীদের চোখেমুখে কেমন জানি একটা চাপা কৌতুক। কান পাতলেই শুনা যাচ্ছিল আশে পাশে ফিসফাস করে ১০৫ নং এর উদ্দেশ্যে রোম খাড়া করে দেওয়া সব সংলাপ। ১০৫ নং রুম সবাইকে অশান্ত করেছে। প্রত্যেকদিনের একঘেয়েমি জীবনযাপনের মধ্যে একটা নতুন আইটেম। সাগরিকা যেন একটা আইবুড়ো, বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাওয়া মেয়ের মত এক নবদম্পতির বাসর রাতের রোমাঞ্চের ঘোরে উদভ্রান্ত ও চঞ্চল !

আমি দীপকবাবুকে আশ্বস্ত করলাম। আমার কোনও অসুবিধা নেই। এমনিতেই একটু সকাল সকাল দেবতামুড়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার কথা, তাই ওখান থেকে দুপুরে ফিরে এসে ঘর পেলেও চলবে। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল ১০৫ নং এর অতিথিদের কথা ভেবে। দুইজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের একটু নিরিবিলি, নির্জন ও একাকী সময় কাটানোর ইচ্ছাটাকে নিয়েও আমাদের দেশের মানুষদের কিসব বিচিত্র ভঙ্গিমা ও কৌতুক ! যেন তারা গুরুতর কোন অপরাধ করে ফেলেছেন। রুম ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মূহুর্তে কত যে বেশরম ও বুভুক্ষু চাহনি নিক্ষেপ হবে তাদের উপর তা ভেবে এক্ষুনি শিউরে উঠলাম।

॥ ৪ ॥

দীপকবাবুর ঠিক করে দেওয়া গাড়ীর মালিক দেবতামুড়া ভ্রমণের জন্য রেইট হাঁকলো ১২০০ টাকা। অমরপুর থেকে দেবতামুড়ার দূরত্ব খুব বেশী হলে বারো কিমি। আমার ঠিক পোষালো না। দক্ষিন ভারতীয় চেহারার ড্রাইভার ১২০০ টাকা থেকে ১ টাকাও কম মানবে না। গাড়ী না নিয়ে বেরিয়ে এলাম। অটোষ্ট্যান্ড থেকে দরদাম করে ১টি অটো নিলেই হবে। রিক্সা নিয়ে চলে এলাম অটোষ্ট্যান্ডে। চারশো টাকায় অটো পাওয়াও গেলো। সুঠাম চেহারার বি.এ পাশ করা যুবক বিপিন। নিজের অটো নিজেই চালায়।

অমরপুর শহরের মধ্য দিয়ে বিপিন আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। শহরের ঠিক মধ্যখানে বিশাল বড় দিঘী। আমাদের ধর্মনগর কালীবাড়ীর দিঘী থেকে প্রায় চারগুণ বড়। নাম অমর সাগর। অমর সাগরের চারপাশেই গড়ে উঠেছে অমরপুর শহরের যাবতীয় সব কর্মকান্ড। অপিস কাছাড়ি, বাজার, স্টেডিয়াম, স্কুল কলেজ সবকিছু। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শহর ছেড়ে দুপাশে ধানক্ষেত রেখে ছোট্ট পীচ রাস্তায় ছুটতে লাগল বিপিনের অটো। ২ কিমি যেতেই থমকে দাঁড়াতে হল। রাস্তা ভাঙ্গা, জল জমে কাদায় একাকার। বিপিন এবার পেছনে তাকালো আমার দিকে। বুঝতে পারলাম বিপিন কি চাইছে। নেমে এসে প্রাণপনে অটো ঠেলে পার করতে হল এই ভাঙ্গা জায়গাটা। কেমন জানি একটু ধাঁধার মত লাগছে। বিপিন কে জিজ্ঞেস করলাম সে কি আমাকে শর্টকাট কোন রাস্তা দিয়ে নিয়ে এসেছে ? দেবতামুড়ার মত এমন একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্রের রাস্তার দশা তো এরকম হবার কথা না।

বিপিন মাথা নাড়লো, "না দাদা এই একটাই রাস্তা। দেবতামুড়া যাওয়ার আর কোনো রাস্তা নাই।" হামাগুড়ি খেতে খেতে অটো এগোচ্ছিল। কলসে জল ভরে এক বালিকা বধু আসছিলেন উল্টো দিক থেকে। আমাদের রাস্তা ছেড়ে দিতে পাশের কাদা জমিতেই তাকে নেমে যেতে হল। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কোন দিকে যাচ্ছি।

একটা অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের সামনে অটো থামিয়ে বিপিন তার একজন পরিচিত দিদিমণির কাছে জানতে চাইল সামনের ভাঙ্গা খাল পেরিয়ে যাওয়া যাবে কি না ! উত্তরে আঁতকে উঠলাম, তিনদিন ধরে রাস্তা বন্ধ। বিপিন আমাকে অভয় দিল। "চলেন দাদা যাই, হয়ত বড় গাড়ী যায় না, অটো যাইতেও পারে।" টিপির টিপির বৃষ্টি শুরু হয়েগেল। অল্প এগিয়েই থেমে যেতে হল আবার। ফিসারী থেকে জল বের করার জন্য আশেপাশের মানুষ ড্রেন বানানোর জন্য রাস্তা টাই কেটে দিয়েছে। এই ড্রেন পেরিয়ে সামনে এগুনো অসম্ভব।

॥ ৫ ॥

রাস্তা কেটে বানানো ড্রেন পেরিয়ে অটোর চাকা আর সামনে যাবে না।

"আর কতদূর দেবতামুড়ার ঘাট ?"

বিপিনের চেহারায় অশনী সংকেত। আমাকে গন্তব্যে নিতে না পারার লজ্জা। সাথে হয়ত চারশো টাকা গচ্চা যাবার ভয়।

আরো প্রায় ৬ কিমি। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে চড়াই উৎরাই কাঁচা রাস্তা। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা হাতে অটো থেকে নামলাম। চারপাশে জঙ্গল নিধনের ছবি সব স্পষ্ট। চারদল করাতি বৃষ্টি ভিজেই আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গাছ কাটায় ব্যস্ত। আমাদের বেহাল দশা যেন একটু উজ্জ্বল করেছে তাদের চেহারা।

উপায় নেই। হয় ফিরে যেতে হবে অথবা এখান থেকে পুরো পাহাড়ি পথটা বৃষ্টির মধ্যেই পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

হঠাৎ কি মনে করে বিপিন ডানদিকের পাহাড়ে উঠতে লাগল। সামনে তিনজনের এক করাতি টিম। তাদের কেটে রাখা দুইটা তক্তা নিয়ে আবার নীচে নেমে এল। বুঝতে পারলাম তার কেরামতি। তক্তা বিছিয়ে তার উপর দিয়ে অটোকে ড্রেন পার করানোর ফন্দি।

আর সেটা হয়েও গেল খুব সহজেই। শুধু অটোর পেছনে ঠেলতে গিয়ে ড্রেনের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তেও অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম। জামা প্যান্টে রাস্তার কাদা মাটি লাগল বিস্তর।

তবু আমরা যেন দুজনেই হাঁফ ছাড়লাম। এখান থেকে ব্যর্থ মনোরথে আবার ফিরে যাওয়া অথবা সামনের প্রায় ছয় কিমি পাহাড়ি রাস্তা হেঁটে দেবতামুড়ার ঘাটে পৌঁছানো - আপাতত এই দুই আশংকা থেকেই মুক্ত। আবার শুরু হল পিচ্ছিল কাঁচা পাহাড়ি রাস্তায় আমাদের অটোবিহার।

কিন্তু হে ঈশ্বর ! কতক্ষণই আর এগুনো গেল সামনে। বড়জোর এক থেকে দেড় কিমি। সেই ভাঙ্গা খাল। জলের তোড়ে খালের উপরের বাঁশের সাঁকো নিরুদ্দেশ। দৃশ্যমান শুধু দুইটা মোটা বাঁশ। এপার থেকে ওপারে সংযোগ স্থাপনকারী। খাল পার করতে হলে এরাই ভরসা। ভারসাম্য হারালে বা পা পিছলে নীচে পড়লে প্রাণ তো বাঁচবে কিন্তু মান বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

জুতো খুলে হাতে হাতে নিলাম। ক্যামেরা, মোবাইল, জলের বোতল ব্যাগে ঢুকিয়ে পিঠে চাপালাম। এতদূরে এসে আবার ফিরে যাবার প্রশ্নই নেই। যা হবার হবে। পেছনে বিপিন তখনও জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। বৃষ্টি নেই। গোমতী খুব কাছে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। জঙ্গল আর গাছগাছালিতে আশেপাশে কিচ্ছু দেখা না গেলেও জলের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। সামনে খাড়া উঁচু পাহাড়। ঠিক এই পাহাড়ের নীচেই যেতে হবে আমাদের। দেবতামুড়া যাবার ডিঙ্গি নৌকা বা স্পিডবোট সেখানে গেলেই পাওয়া যাবে।

খাল পেরোনোর জন্য বাঁশের উপর পা রাখতেই আর একবার চোখে ভেসে উঠল ত্রিপুরার পর্যটন নিগমের সৌজন্যে রাস্তার পাশে টাঙানো বিশাল সেইসব দামী পোস্টার। সাথে যেন শুনতে পেলাম আগরতলা পর্যটন সহায়তা কেন্দ্রের সেই মিষ্টিভাষী মহিলার রিনরিনে গলায় অভ্যর্থনা- "দেবতামুড়া আপনার জন্য একদম রেডি।"

একটু কটু ঢেঁকুর উঠল। সকালে অটোস্ট্যান্ডে খাওয়া পুরী সব্জী ঠিকমতো হজম হয়নি।

॥ ৬ ॥

প্রায় চার কিমি পাহাড়ি রাস্তা পায়ে হেঁটে দেবতামুড়ার ঘাটে পৌছে একটু জিরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বসার জায়গা খুঁজার জন্য এদিক ওদিক চাইতে বুঝতে পারলাম আপাতত ঘাটে সর্বসাকুল্যে

আমরা সাতজন প্রাণী। আমি, বিপিন আর পাঁচটা পুষ্ট পাহাড়ি গরু। দুটি হালফ্যাশনের দামী বাইক সট্যান্ড করে রাখা। নদীর ঘাট বলতে যা বুঝায় তা কিছুই নয়। কাঠ বা বাঁশ দিয়ে তৈরী প্ল্যাটফর্ম বা মাচার কোন অস্তিত্বই নেই। এই জায়গায় গোমতী প্রায় ৯০° বাঁক নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ডান দিকে পাথুরে পাহাড়ের ঢাল খাড়া হয়ে নীচে নেমে এসেছে। সেই পাথুরে ঢাল বেয়ে পাহাড় থেকে নদীতে জলের ধারা নামছে। আর ডানদিকে স্রোতের অনুকূলে প্রায় ৩ কিমি. পাথুরে ঢালে খোদাই করা মূর্ত্তিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

চারদিকে ঘন সবুজের মধ্যে দেবতামুড়ার ঘাট যেন কোন রহস্যময়ী ষোড়শীর মতো নিজেকে লুকিয়ে বসে আছে তার প্রেমিকার অপেক্ষায়। আর সেই প্রেমিকা যে অন্তত আমি নই - তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ঘাটে কিচ্ছু নেই-কোন ডিঙ্গি নৌকা বা স্পিডবোট। বিপিন এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করতে লাগল। যদি কাউকে পাওয়া যায়। কিন্তু একদম শুনশান চারপাশ। শুধু বর্ষায় ফুলে উঠা গোমতীর গোঙানির শব্দ।

ত্রিপুরার বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র দেবতামুড়া বা ছবিমুড়ার ঘাটে আমি এক হরিদাস পাল আমার সাথে আসা বি.এ পাশ অটো চালক বিপিন আর পাঁচটি পাহাড়ি নধর গাভী পরস্পর পরস্পরের সাথে দৃষ্টি ও মত বিনিময় করে প্রায় একঘন্টা নদীর পাড়ে বসে মাঝির অপেক্ষায় কাটিয়ে দিলাম।

॥ ৭ ॥

মাঝি আর আসেনি। দেখা মেলেনি বাইক আরোহীদেরও। শুধু দেখা মিলল গরু চরাতে আসা এক পাহাড়ি কিশোরের।

তার কাছ থেকেই জানলাম প্রায় একমাস ধরে স্পীডবোটের ইঞ্জিন নষ্ট। আর ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে মাঝিরা বেরিয়ে গেছে মাছ ধরতে। ফিরতে ফিরতে বিকাল।

দেবতামুড়া দর্শনের সব চেষ্টা বিফলে গেল। কিন্তু তারপরও কেন জানি খুব একটা হতাশ হইনি। আমার ভালবাসার ত্রিপুরার সুদূর কোনে লুকিয়ে থাকা রহস্যময়ী দেবতামুড়া দর্শনের কোন চেষ্টাতেই খামতি রাখিনি। হয়ত আমার কপালেই নেই দেবতামুড়া দর্শন। অধার্মিক ও নাস্তিক শয়তানের উপর করুণাময়ী দেবতার তুমুল প্রতিশোধ !

ফেরার পথে গুনগুনিয়ে গান ধরল বিপিন। বৃষ্টির পরের নরম হাওয়ায় আমরা দুই উদাস পথিক গোমতীর পার ধরে ধরে ফিরে যাচ্ছিলাম। বিপিন বারবার অনুরোধ করছিল পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে আসার জন্য।তখন বিশাল মেলা বসে দেবতামুড়ার বুকে। ভি.ভি.আই.পি, টি.এস.আর. আর পুণ্যার্থীর ভীড়ে গজগজ করে চারপাশ। নৌকা, স্পীডবোটে গোমতীর জল তোলপাড়। লালবাতির গাড়িগুলিকে অভ্যর্থনা জানায় সদ্য পীচ হওয়া মসৃণ রাস্তা।

আর হঠাৎ যদি ভুল করে আমার মত কোন খেয়ালী পর্যটক দেবতামুড়ায় চলে আসেন উৎসবের এই দিনটিকে এড়িয়ে ! প্রশ্নের উত্তরটা জানা হয়ে গিয়েছে আমার। আপনিও জেনে নিতে পারেন। চলে আসুন একদিন সবাইকে নিয়ে।

"দেবতামুড়া আপনার জন্য একদম রেডি ।"

****